ফল সংগ্রহ :

* লিচুর গায়ে যখন লাল রং আসে এবং মিষ্টি স্বাদ হয় তখনই ফল সংগ্রহ করতে হয়।
* লিচুর মোট দ্রবণীয় দ্রব্যর বেশি হবে।
* ফল সংগ্রহের সময় বাগান যেন স্বাস্থ্যকর থাকে।
* ফল সংগ্রহ সকাল ৮টার মধ্যে শেষ করতে হবে।
* ডালসহ ফলপাড়ার পর লিচু বোঁটাসহ পৃথক করতে হবে।
* ফল পাড়ার পর প্লাস্টিক ক্রেটে রাখতে হবে ; যেন মাটিতে না রাখা হয়।
* ফল পাড়ার সাথে সাথে প্যাকিং হাউসে পাঠাতে হবে।

ছাঁটাই ও বিন্যাসকরণ :

* ফল সংগ্রহের সময় ১৫ সে.মি. পর্যন্ত লিচুসহ ডাল ছাঁটতে হবে।
* মাকড় আক্রান্ত হলে ছেঁটে পুড়িয়ে ফেলতে হবে।
* রোগাক্রান্ত, মৃত, শুকনো ডালপালা, ঘষাঘষি অবস্থায় থাকা ডাল ছেঁটে ফেলতে হবে।

- **জুন (মাঝ জ্যৈষ্ঠ -মাঝ আষাঢ়)**

ফল সংগ্রহ :

* মাঝারি এবং নাবি জাতের লিচু সংগ্রহ করতে হবে।

ছাঁটাই এবং বিন্যাসকরণ :

* আগের মাসে না করা থাকলে মাকড় আক্রান্ত, রোগাক্রান্ত, শুকনো, মৃত ডাল ছাঁটাই করতে হবে।

মাকড় নিয়ন্ত্রণ :

* মাকড় আক্রান্ত ডাল ছেঁটে পুড়িয়ে ফেলতে হবে।
* জলে গোলা গন্ধক (সালফেক্স) ২ গ্রাম ১ লিটার জলে বা মনোক্রোটোফস ১.৫ মি.লি. ১ লিটার জলে গুলে স্প্রে করতে হবে।

ডাল শুকিয়ে যাওয়া (ডাই ব্যাক) নিয়ন্ত্রণ :

* লিচুগাছের গোড়ায় কাছে থাইরাম বা ক্যাপটাফ গাছপ্রতি ১০০-১৫০ গ্রাম প্রয়োগ করতে হবে।

নালিপোকা, কৃমি এবং ফল ছিদ্রকারী পোকার প্রতিরোধ :

* সার প্রয়োগের সময় প্রয়োগ না হয়ে থাকলে গাছপ্রতি ৪ কেজি নিমখোল এবং ১ কেজি রেড়িখোল প্রয়োগ করতে হবে।
* গাছের বয়স অনুযায়ী পরিমাণমতো জৈব এবং অজৈব সার প্রয়োগ করতে হবে।

* অনুখাদ্য যেমন জিঙ্ক সালফেট ১০০ গ্রাম এবং বোরাক্স (সোহাগা) ৪০ গ্রাম গাছপ্রতি মাটিতে ব্যবহার করতে হবে প্রত্যেক তৃতীয় বছরে।

মধ্যবর্তী পরিচর্যা :

* যদি বৃষ্টি শুরু হয় বাগানে চাষ এবং জলসেচের নালা থাকলে ভেঙে দিতে হবে।

জলসেচ (বৃষ্টি না হলে) :

* নতুন বসানো চারাগাছে জলসেচ দিতে হবে।
* সার প্রয়োগ করা বাগানে জলসেচ দিতে হবে।

- **জুলাই (মাঝ আষাঢ় - মাঝ শ্রাবণ)**

মধ্যবর্তী পরিচর্যা :

* আগের মাসে না করা হলে বাগানে চাষ দিতে হবে।

সার প্রয়োগ :

* পরিমাণমতো সার প্রয়োগ করতে হবে।

ছাঁটাই এবং বিন্যাসকরণ :

* আক্রান্ত ডালপালা ও ডগা ছাঁটাই করতে হবে।

জল নিষ্কাশন :

* বাগান থেকে অতিরিক্ত জল বের করতে হবে। তার জন্য নিকাশি নালা তৈরি করতে হবে।

ডাল শুকিয়ে যাওয়া (ডাই ব্যাক), কৃমি ইত্যাদি নিয়ন্ত্রণ :

* আগের মাসে ব্যবহার না করা থাকলে গাছপ্রতি থাইরাম বা ক্যাপটাফ ১০০-১৫০ গ্রাম প্রয়োগ করতে হবে।
* যদি আগের মাসে না হয়ে থাকে, তবে কৃমি অন্যান্য কীট শত্রু নিয়ন্ত্রণের জন্য নিমখোল এবং রেড়ির খোল প্রয়োগ করতে হবে।

কাণ্ড ছিদ্রকারী পোকা নিয়ন্ত্রণ :

* তার দিয়ে গর্ত পরিষ্কার করতে হবে।
* মেটাসিড বা নুভান ইত্যাদিতে তুলো ভিজিয়ে গর্তের মুখ বন্ধ করে দিতে হবে।

- **আগস্ট (মাঝ শ্রাবণ - মাঝ ভাদ্র)**

কীটনাশক নিয়ন্ত্রণ :

* লিচু মাকড় — আগের মাসের মতো, যদি করা না হয়ে থাকে।

* কাণ্ড ছিদ্রকারী পোকা — ওই।

জলসেচ ও জল নিষ্কাশন :

* বৃষ্টি না হলে জলসেচ এবং অতিরিক্ত বৃষ্টি হলে জল নিষ্কাশন করতে হবে।

- **সেপ্টেম্বর (মাঝ ভাদ্র - মাঝ আশ্বিন)**

কীটনাশক নিয়ন্ত্রণ :

* লিচু মাকড় — আগের মাসের মতো।
* নালি পোকা — এন্ডোসালফন ১.৫ মি.লি. ১ লিটার জলে গুলে পাতায় স্প্রে করতে হবে।

- **অক্টোবর (মাঝ আশ্বিন - মাঝ কার্তিক)**

কীটনাশক নিয়ন্ত্রণ :

কাণ্ড ছিদ্রকারী পোকা — আগের মাসের মতো।

লিচু মাকড় — আগের মাসের মতো।

নালি পোকা — আগের মাসের মতো।

গাছের কাণ্ড মাটির তল থেকে ১ মিটার পর্যন্ত চুন ও তুঁতের প্রলেপ দিতে হবে।

আগাছা নিয়ন্ত্রণ :

* বাগানে গভীরভাবে চাষ দিতে হবে।
* পাটা দিয়ে মাটি সমতল করতে হবে।
* রাউন্ড আপ ২ কেজি / হেক্টর মাটিতে স্প্রে করতে হবে।

- **নভেম্বর (মাঝ কার্তিক - মাঝ অগ্রহায়ণ)**

* গাছের পাতায় যদি দস্তা (জিঙ্ক), বোরন বা অন্যান্য অনুখাদ্যের ঘাটতিজনিত লক্ষণ দেখা যায়, তবে জিঙ্ক সালফেট ২ গ্রাম এবং বোরাক্স (সোহাগা) ২ গ্রাম প্রতি লিটার জলে গুলে স্প্রে করতে হবে।

কীটশত্রুর নিয়ন্ত্রণ :

কাণ্ড ছিদ্রকারী পোকা — আগের মাসের মতো।

লিচু মাকড় — আগের মাসের মতো।

নালি পোকা — আগের মাসের মতো।

আনারস চাষ

উন্নত জাত :

জায়েন্ট কিউ, কুইন, মরিশাস লাল-হলুদ, বারুইপুর, হরিচরণ ইত্যাদি।

বংশ বিস্তার :

আনারস গাছের বংশবিস্তার বা চারা অঙ্গজ জনন পদ্ধতিতে তৈরি করা হয়। গাছের বিভিন্ন অংশ থেকে উৎপন্ন তেউড় (Sucker) চারা হিসাবে ব্যবহৃত হয়। এগুলির গুণগত মানও যেমন আলাদা, তেমন নামও আলাদা। যেমন—গাছের গোড়া ও মাটির নিচে থেকে উৎপন্ন 'ভূমি তেউড়'; কাণ্ডের কক্ষ থেকে উৎপন্ন 'কাণ্ড তেউড়' বা 'পার্শ্ব তেউড়'; ফলের বোঁটা থেকে উৎপন্ন 'ফলবৃন্ত তেউড়' বা 'তেউড়' (ডাল্ডিচারা); ফলের মাথায় /চূড়ায় উৎপন্ন 'মুকুট তেউড়'। এছাড়া আনারস গাছে ফল ধরার আগে এর কাণ্ডকে তিনটি চোখসহ টুকরো টুকরো করে কেটে নার্সারিতে লাগিয়ে প্রতিটি টুকরো থেকে চারা তৈরি করা হয়।

চারা বাছাই :

সাধারণত ২৫-৩০টি পাতাযুক্ত, ৩০-৪০ সেমি লম্বা, ৪০০-৫০০ গ্রাম ওজনের পাঁচমাস বয়সের উপযুক্ত শিকড়যুক্ত চারাই আদর্শ। আনারসের রং, আকার, ওজন ও মিষ্টতা ইত্যাদি বিচারে 'কাণ্ড তেউড়' 'পার্শ্ব তেউড়' চারা হিসাবে বাছাই করা উচিত। তবে তিন ধরনের চারাই বসানো চলে। তবে 'ভূমি তেউড়' ও 'কাণ্ড তেউড়, চারায় ফল আসতে ১৬-১৮ মাস, 'ফলবৃন্ত তেউড়' থেকে ২০-২২ মাস এবং 'মুকুট তেউড়' থেকে ২৪-২৬ মাস সময় লাগে। চারা নির্বাচন সব সময়ই স্থানীয় অবস্থা, চারা আমদানি এবং চাষির ইচ্ছার উপর নির্ভরশীল হলেও আদর্শ চারা নির্বাচন করার দিকে নজর দিতে হবে।

চারা প্রস্তুতি :

'মা-গাছ' থেকে আলাদা করা চারাগুলির গোড়ার শুকনো ৪-৫টি পাতা ছাড়িয়ে প্রায় দিন ১৫ ছায়ায় ফেলে রাখতে হবে। এরপর জমিতে রোপণ করলে গাছের স্বাস্থ্য ভালো হওয়ায় ফলের ওজন, মান ও আকার বাড়ে।

চারা শোধন :

চারার মাধ্যমে দয়ে পোকা ও অন্যতম রোগ 'চারার মাঝ মরা' বা 'হার্টরট' নিয়ন্ত্রণের জন্য চারাশোধন অবশ্যই করতে হবে। ছত্রাকনাশক ও কীটনাশকের মিশ্র দ্রবণে যেমন —প্রতি লিটার জলে ২ গ্রাম কার্বেন্ডাজিম (ব্যাভিস্টন, ডেরোসাল ইত্যাদি), পরিবর্তে ছত্রাকনাশক কার্বেন্ডাজিম ও ম্যানকোজেবের মিশ্রণ ১.৫ (সাফ, সাথী ইত্যাদি) এবং প্রতি লিটার জলে ০.৫ মি.লি. ইমিডাক্লোপ্রিড (কনফিডর, টাটামিডা ইত্যাদি) ২০ মিনিট ডুবিয়ে শোধন করে ছায়ায় কিছু সময় শুকিয়ে রোপণ করতে হবে।

চারা রোপণের পদ্ধতি :

চারা আকার অনুযায়ী ৫-১২ সেমি গভীরতায় চারা বসাতে হবে। চারা বসিয়ে গোড়ার চারপাশের মাটি ভালোভাবে চেপে দিতে হবে। লক্ষ রাখা দরকার, যেন চারার উপর মাটি না পড়ে। চারার গোড়ার দিকে কয়েকটি পাতা কেটে নিয়ে বসালে গাছ মাটিতে সহজে পোঁতা যাবে এবং দ্রুত শিকড় ছাড়বে। চারার আকার, বৃদ্ধি অনুযায়ী বড়, মাঝারি ও ছোট শ্রেণি বিভাগ করে আলাদা আলাদাভাবে লাগানো ফসল পরিচর্যায় সুবিধা হয়।

দ্বিসারি বা জোড়াসারি পদ্ধতিতে জোড়াসারিতে পাশাপাশি বা কোনাকুনিভাবে অর্থাৎ যেখানে প্রথম সারির দুটি চারার মাঝামাঝি দ্বিতীয় সারির প্রথম চারা লাগাতে হবে, পরের চারাগুলি একইভাবে রোপণ করে যেতে হবে।

রোপণের দূরত্ব হল ৩৫ সেমি X ৪০ সেমি X ১০০/১২০ সেমি। অর্থাৎ চারা থেকে চারার দূরত্ব ৩৫ সেমি সারি থেকে সারির দূরত্ব ৪০ সেমি এবং প্রত্যেক জোড়া সারির মধ্যে দূরত্ব ১০০/২০০ সেমি এবং গর্তের গভীরতা ২০ সেমি। এতে চারার সংখ্যা বিঘা (৩৩ শতক) প্রতি ৬০০০/৫৩৩৫টি লাগাবে।

একক সারি পদ্ধতিতে গাছের সারি থেকে সারির দূরত্ব ১৫০ সেমি ১৮০ সেমি এবং প্রতি সারিতে চারা থেকে চারার দূরত্ব ৬০ - ৯০ সেমির মতো রাখা হয়। কুইন, মরিশাস প্রভৃতি জাতের পাতায় যথেষ্ট কাঁটা থাকার জন্য পরিচর্যা ও ফল তোলার সুবিধার্থে এই পদ্ধতি মেনে চারা বসানো হয়।

উভয় পদ্ধতিতে তুলনামূলকভাবে বড় আকারের আনারস ২ - ৩ কেজি ওজনের হয়। এগুলো সরাসরি খাওয়ার উপযোগী হয়।

অতি ঘন চারা রোপণের পদ্ধতি :

জোড়া সারি ত্রিকোণ পদ্ধতি অর্থাৎ দুটি সারির পর কিছুটা জায়গা ছাড় দিয়ে আবার দুটি সারি লাগানো হয়। একটি সারিতে চারা লাগানো হয় পাশের দুই সারির মাঝ বরাবর জায়গায়। রোপণের দূরত্ব হল ২৫ সেমি x ৩৫ সেমি x ৯০ সেমি। অর্থাৎ সারিতে চারা থেকে চারার দূরত্ব ২৫ সেমি, সারি থেকে সারির দূরত্ব ৩৫ সেমি এবং প্রত্যেক জোড়া সারির মধ্যে দূরত্ব ৯০ সেমি এবং গর্তের গভীরতা ১৫ সেমি।

এই পদ্ধতিতে চারা রোপণ করলে বিঘা (৩৩ শতক) প্রতি প্রায় ৮৫৩৩টি চারা লাগবে।

খাদ্য উপাদান ও সার প্রয়োগ :

আনারস স্বল্পমূল্যের ফসল আর নাইট্রোজেন ও পটাশ অপেক্ষা ফসফেটের প্রয়োজন একেবারে কম।

প্রয়োগ সময়	খাদ্য উৎপাদন (গাছপিছু)			রাসায়নিক সার প্রয়োগ সি.সু.		
	N	P	K	ইউরিয়া	ফসফেট	পটাশ
	১২ গ্রাম	অভাবি মাটিতে ৮গ্রাম	১২ গ্রাম	২৭ গ্রাম	২৫ গ্রাম	২০ গ্রাম

প্রথম চারা লাগানোর ২ মাস পর আর ইউরিয়া ৬টি ভাগে ২ মাস পরপর। পুরো ফসফেট ও ১/২ পটাশ লাগাবার সময় বাকি পটাশ ৬ মাস পর। জিঙ্ক, বোরন, মালিবডেনাম সমন্বিত অনুখাদ্য স্প্রে ফল আসার ১২ মাস আগে ও পরে আর বাড়বৃদ্ধির সময় প্রয়োগ জরুরি।

উত্তরবঙ্গের অম্ল মাটিতে রক ফসফেট ভালো। দ্বিতীয় বছর বা মুড়ি ফসলে ফুল আসার সময় (চৈত্র-বৈশাখ) ১২-১৩ গ্রাম ইউরিয়া ও ফসফেট আর ১০ গ্রাম পটাশ। বাকি একই পরিমাণ বর্ষা শেষে।

আনারস গাছে ফুল ও ফল আসা নিয়ন্ত্রণ করা :

আনারস চাষের একটি গুরুত্বপূর্ণ সমস্যা হল গাছে বিক্ষিপ্তভাবে এবং অনিয়মিত ফুল আসা। সঠিকভাবে এবং ভালো পরিচর্যা করা সত্ত্বেও ১৫ - ১৮ মাস পরেও স্বাভাবিকভাবে শতকরা ৪০ - ৫০টি গাছে ফাল্গুন মাসে ফুল আসে। এতে যেমন পরিচর্যার অসুবিধা হয় আবার আষাঢ় - শ্রাবণ মাসে একসাথে বেশির ভাগ ফল বাজারে চলে আসায় ফলের দাম চাষিভাইরা কম পান। সুতরাং উপযুক্ত বাজারদর পেতে এবং প্রক্রিয়াকরণ শিল্পের চাহিদা মেটাতে তাই আনারস গাছের ফুল আসা নিয়ন্ত্রণ করা খুবই জরুরি। ইচ্ছামতো ফুল আনার জন্য ক্যালসিয়াম কার্বাইড, ইথেফন, ইউরিয়া, সোডিয়াম কার্বনেট ইত্যাদি রাসায়নিক পদার্থ ব্যবহার করে ১৫-২৫ দিনের মধ্যে ফুল আনা সম্ভব হয় এবং ফুল আসার ৫ -৬ মাসের মধ্যে ফল হয়। চারা বসানোর ১১ - ১২ মাসের মধ্যে গাছে যখন ৩৫ - ৪০ টি পাতা হলে সকাল বেলায় ০.৪ গ্রাম সোডিয়াম বা ক্যালসিয়াম কার্বনেট মিশিয়ে দ্রবণ তৈরি করে, দ্রবণের ৫০ মি.লি. প্রয়োগ করতে হবে। অথবা (২) ২ গ্রাম ক্যালসিয়াম কার্বাইড মিশিয়ে দ্রবণ তৈরি করতে হবে। অথবা (৩) প্রতি লিটার জলে ২০ গ্রাম ক্যালসিয়াম কার্বাইড গুলে ৫০ মি.লি. টাটকা দ্রবণ প্রয়োগ করতে হবে। প্রথম দ্রবণ মিশ্রণ রপ্তানিযোগ্য আনারস উৎপাদনে প্রয়োগ করা, যেমন সহজ তেমনি বাঞ্ছনীয়।

আনারস ফলের আকার বাড়ানো ও মাথা (মুকুট) ছোট করা :

প্রয়োজনে আনারস ফলের আকার বাড়ানো যায়। ফলের আকার বড় করা, সাথে ফলের মাথা (মুকুট) ছোট রাখাও খুব প্রয়োজন, এতে ফল পরিবহণের খরচ কমে। গাছে ফুল আসার ৪৫ - ৫০ দিন পর এন.এ.এ. হরমোন (প্ল্যানোফিক্স) প্রতি ৪.৫ লিটার জলে ১ মি.লি. গুলে স্প্রে করলে ফলের আকার বেড়ে ওজন ১৫ - ২০ শতাংশ বেড়ে যায়। মনে রাখা দরকার পরবর্তী সময়ে আরও হরমোন প্রয়োগ করলে ফলের আকার বাড়ে না। উপরন্তু ফল পাকতে দেরি করে, ফল স্বাদে জোলো ও টক হয়ে যায়। ফলের মাথা (মুকুট) যেহেতু ফল থেকে খাবার নিয়ে বড় হয় সেজন্য মাথা না বাড়তে দিলে ফলের আকার স্বাভাবিকভাবে বেড়ে যায়। সেজন্য ফুল আসার ৪৫ - ৫০ দিন পরে

ফলের মাথার কয়েকটি পাতা ছিঁড়ে দিতে হয়। এতে মাথা বড় হয় না, ফল বড় হয়। মাথা (মুকুট) ছোট থাকে।

সারা বছর ধারাবাহিক ফলন পাওয়া :

আনারস চাষের সমস্ত জমিকে কয়েকটা খণ্ডে ভাগ করে এক মাস পর পর পর্যায়ক্রমে একই মাপের চারা রোপণ করতে হয়। এছাড়া একই শ্রেণির চারা বৃদ্ধি / মাপ অনুযায়ী ছোটো, মাঝারি ও বড় হিসাবে আলাদা আলাদা খণ্ডে রোপণ করতে হয়। তারপর গাছের বয়স ১১ - ১২ মাস হলে আগে বর্ণিত রাসায়নিক প্রয়োগ করে সারা বছর ধরে ধারাবাহিক ফলন পাওয়া যায়।

ফল তোলা ও ফলন :

এই ফল আম বা কলার মতো নয়, কেবল গাছে থাকতেই পাকে। পুরো পাকলে স্থানীয় বাজারে ও প্রক্রিয়াকরণে আর দূরের বাজারে কিছুটা পাকা শুরু হলে তুলে পাঠানো উচিত। এক্ষেত্রে নিচের দিকের চোখগুলো উঁচু ও কমলা-হলুদ হলে, পুষ্ট পাকা ফল মুকুট ও ৫ সেমি বোঁটাসমেত তেরছাভাবে কেটে তোলা উচিত। ফলন-ঘনত্ব ও গাছের সংখ্যার উপর নির্ভরশীল। তবে বিঘাপ্রতি ১২-১৫ টন ফলন হয়।

রোগপোকা ও শারীরবৃত্তীয় সমস্যা নিয়ন্ত্রণ :

শারীরবৃত্তীয় সমস্যা ও প্রতিকার :

(১) **ফল ঝলসানো :** রোদের তাপে পুষ্ট আনারস হবার সময় একদিক ঝলসে কালো হয়ে নষ্ট হয়ে বা পচে যায়।

প্রতিকার ঃ পরিচর্যার সময় ফল খড় বা পাতা দিয়ে ঢেকে দেওয়া।

(২) **অনেক মুকুটযুক্ত ও বিকৃত ফল :** একটি সুঠাম মুকুটের পরিবর্তে অনেকগুলি ছোট মুকুট আবার ফলের সঙ্গে জোড়া লেগে চ্যাপ্টা বিকৃত ফল তৈরি হয়। জিনগত সমস্যার সঙ্গে ক্যালসিয়াম ও দস্তা / জিঙ্কের ঘাটতিযুক্ত মাটিতে হয়।

প্রতিকার : এরকম গাছ দেখতে পেলে তুলে ফেলা আর এসব গাছের তেউড় না নেওয়া, সঙ্গে সঠিক সার ব্যবস্থা ও অনুখাদ্য স্প্রে।

আনারসের রোগ ও প্রতিকার :

(১) **মাঝপচা / গলাপচা / হার্টরট :** আনারসের প্রধান ছত্রাকজনিত রোগ। আক্রমণের প্রথমে পাতা হলুদ হয়ে বাদামি হয়। মাঝের পাতা বেঁকে যায় ও ভিতরের পাতা পচে উঠে আসে। কাণ্ডের গোড়ার উপর হলুদ-বাদামি রং হয়ে পচতে থাকে।

প্রতিকার : উন্নত জলনিকাশির সঙ্গে গোড়ায় মাটি তুলে দেওয়া। রোগাক্রান্ত বাগানের তেউড় একেবারেই ব্যবহার না করা। আবশ্যিক চারা/তেউড় শোধনের সঙ্গে রোগ সামান্য দেখলেই গাছ তুলে বিনষ্ট করার সঙ্গে মেটালাক্সিল + ম্যানকোজেব ২.৫ গ্রাম বা সাইমক্সানিল + ম্যানকোজেব ২ গ্রাম বা অ্যাজডিরক্টিন ২ মি.লি. জলে আঠা দিয়ে স্প্রে।

(২) **ঢলে পড়া বা উইল্ট :** ছত্রাক আক্রান্ত গাছের পাতার সবুজ রং খয়েরি হয়ে আগা থেকে শুকিয়ে গাছ ঢলে পড়ে। শিকড়সুদ্ধ নষ্ট হবার ফলে গাছ বসে যায়।

প্রতিকার : উপরের মতোই।

(৩) **ফলপচা :** অন্যতম প্রধান ছত্রাকঘটিত রোগে ফল তোলা বা তোলার পর প্রথমে ফলের উপর জলবসা দাগ পরে বাদামি হয়ে পচে। চোখগুলো কালো হয়ে পুরো ফলসমেত বোঁটাও পচতে থাকে।

প্রতিকার : ফল সংগ্রহে বোঁটা ১০% অ্যালকোহলে গোলা বেঞ্জোয়িস অ্যাসিডে ১০ - ১২ মিনিট ডুবিয়ে নেওয়া। সতর্কতার সঙ্গে ফল সংগ্রহ ও আক্রমণে মাঝপচার অনুরূপ স্প্রে।

(৪) **ব্যাকটিরিয়াজনিত পচা :** তিন-চার মাসের চারাগাছের গোড়ায় ভেজা দাগ হয়ে, পাতায় সবুজ নষ্ট হয়ে, পাতায় হলদে ছোপ দাগ দেখা যায়। মাঝের পাতা টানলে উঠে আসে।

প্রতিকার : জলনিকাশি ভালো রাখার সঙ্গে চারা শোধন ও রোগ দেখা গেলে এগ্রিমাইসিন ১ গ্রাম / ১০ লিটারে বা ব্যাকটিরিয়ানাশক ০.৪ গ্রাম / লি. জলে গোড়া ভিজিয়ে স্প্রে।

(৫) **ব্যাকটিরিয়াজনিত ফলপচা :** পাকা ফলের বাইরে ও ভিতরে ভেজা দাগ করে পচে দুর্গন্ধ বেরোয়।

প্রতিকার : উপরের পচা রোগের মতো।

(৬) **ভাইরাসঘটিত ঢলে পড়া :** গাছে দয়ে পোকার আক্রমণ হয়, যার মাধ্যমে ফ্যাকাসে হয়ে বৃদ্ধি বন্ধ হয়ে যায়। গাছের বাইরে তৃতীয়-চতুর্থ পাতার গোড়া বাদামি লাল রঙের হয়। পাতা ডগার দিক থেকে শুকিয়ে শিকড় পচে গাছ পুরো ঢলে পড়ে।

প্রতিকার : দয়ে পোকা নিয়ন্ত্রণের সঙ্গে রোগাক্রান্ত গাছ দেখামাত্র তুলে পুড়িয়ে/পুঁতে বিনষ্ট করা। তেউড় ৫০°-৬০° সে. তাপে গরমজলে শোধন করে নেওয়া। গাছের গোড়ায় ২.৫ গ্রাম ডাইসিসটোন প্রয়োগ।

কীটশত্রু ও প্রতিকার :

১) **দয়ে পোকা :** প্রধান কীটশত্রু যা পাতার গোড়ায়, খাঁজে, মঞ্জুরি দণ্ডে একসাথে রস চুষে গাছকে বিবর্ণ করার সঙ্গে ভাইরাস রোগ ছড়ায়। ছোট অবস্থা থেকেই আক্রমণ শুরু হয়।

প্রতিকার : চারা/তেউড় কীটনাশক দিয়ে শোধন। গাছপ্রতি ৫ গ্রাম কার্বোফুরান বা কাটাপ হাইড্রোক্লোরাইড বা রিনক্সিপির দানা দেওয়া মাসখানেক পরে। আক্রমণ দেখা গেলে কার্বোসালফান ২ মিলি বা জৈব ওষুধ সিন্নামিক অ্যাসিড ২ মি.লি. /লি. প্রতি জলে স্প্রে।

২) **নিমাটোড/মাটির কৃমি :** আক্রমণের মূলে গুটি হয় বা ফুলে যায়। গাছ বসে ফল ধরে না।

প্রতিকার : জমি তৈরিতে ২ কেজি প্যাসিলোমাইসিস লিলাসিনাস জৈব সারের সঙ্গে প্রয়োগের সাথে ১০০ কেজি নিমখইল প্রয়োগ, খুব বেশি আক্রমণে ২বার আনারস চাষ বন্ধ রেখে চুন প্রয়োগ করা উচিত।

পেয়ারা চাষ

বিভিন্ন ফলের মধ্যে পেয়ারার চাষ অত্যন্ত লাভজনক, কারণ এটি বছরে তিনবার ফল পাওয়া যায় এবং যার বাজারের চাহিদাও খুব বেশি।

উন্নত জাত : লক্ষ্ণৌ-৪৯, এলাহাবাদ সফেদা, বারুইপুর, খাজা ইত্যাদি।

রোপণের সময় : আষাঢ় থেকে ভাদ্র মাস (জুন থেকে সেপ্টেম্বর)

রোপণের দূরত্ব : ৫মি x ৫মি (১৫ ফুট x ১৫ ফুট)

গর্তের আকার : ২ ফুট x ২ ফুট x ২ ফুট

গর্ত খোঁড়ার আগে সমস্ত জমিতে ফিতে বসিয়ে নির্দিষ্ট দূরত্বে যেখানে গাছ লাগানো হবে সেগুলি চিহ্নিত করুন ও জ্যৈষ্ঠ মাসে গর্ত খুঁড়ে রাখুন। গর্ত খোঁড়ার সময় নীচের অর্ধেক মাটি গর্তের বাঁ-পাশে ও উপরের মাটি গর্তের ডানপাশে রাখুন। এরপর এক সপ্তাহ ভাল করে রোদ খাওয়ান। ১ সপ্তাহ পরে নীচের অর্ধেক মাটির সাথে গোবর সার, সুপার ফসফেট ও উইপোকা-প্রবণ এলাকায় ৫০ গ্রাম কার্বোফুরান ভালো করে মিশিয়ে গর্ত ভরাট করুন।

জৈব ও রাসায়নিক সার প্রয়োগ :

সার	গর্তপ্রতি	গাছ লাগানোর ১ বছর পর	পূর্ণমাত্রায় ফলন্ত গাছ	পুরো সার দুভাগে ভাগ করে একভাগ বর্ষার আগে (জ্যৈষ্ঠ মাসে) ও বাকি একভাগ বর্ষার পরে (আশ্বিন-কার্তিক মাসে) দিতে হবে।
গোবর সার	২০ কেজি	২০ কেজি	৫০ কেজি	
নাইট্রোজেন	—	৫০ গ্রাম	৪০০ গ্রাম	
ফসফরাস	৮০	১০০ গ্রাম	২৫০ গ্রাম	
পটাশিয়াম	—	৫০ গ্রাম	২৫০ গ্রাম	

পরিচর্যা : ভালো ফলন পেতে হলে পেয়ারাগাছের নিয়মমতো ট্রেনিং ও ডাল ছাঁটা দরকার। ট্রেনিং-এর মুখ্য উদ্দেশ্য হল শক্তপোক্ত কাঠামোর গাছ তৈরি করা, যাতে ঝড় বা ফলের ভারে ডাল ভেঙে না পড়ে। তাছাড়া ট্রেনিং-এর ফলে বাগান পরিচর্যার সুবিধা হয় এবং গাছ অনেকদিন ফলন দেয়। গাছ বসানোর প্রথম ৪ বছর ট্রেনিং করা হয়। ১ম বছরে প্রধান কাণ্ডের নীচে থেকে বা শিকড় থেকে জন্মানো অবাঞ্ছিত ডাল কিংবা জোড়-কলমের গাছের গোড়ার নীচ থেকে জন্মানো অবাঞ্ছিত ডাল ছেঁটে ফেলা হয়। ২য় বছরে প্রধান কাণ্ডে মাটি থেকে ২-৩ ফুট ওপরে ৩-৪ টি সবল ডাল রেখে বাকি ডাল ছেঁটে ফেলা হয়। এই ডালগুলি পরে কাণ্ডের চারদিকে স্থায়ী কাঠামো তৈরি হয়। তাছাড়া ওই উচ্চতার নীচ থেকে কোনো ডাল বার হলে তা ছেঁটে ফেলা হয়। ৩য় বছরে জ্যৈষ্ঠের মাঝামাঝিতে কাঠামোর ডাল থেকে যে সব খাড়াই লকলকে ডাল বার হয়, তা ছেঁটে ফেলা হয় এবং যেসব সমান্তরাল মজবুত ডাল বার হয়, তা

রেখে দেওয়া হয়। এই রাখা ডালগুলি পরবর্তীতে ফল দেবে। ৪র্থ বছরে কাণ্ডের গোড়া ও শিকড় থেকে গজানো ডাল ছাঁটা হয়। তার সাথে সাথে লাগালে ও ঠিকমতো ট্রেনিং সার প্রয়োগ ও সঠিক সময়ে সঠিক মাত্রায় ওষুধ প্রয়োগ করে রোগপোকা নিয়ন্ত্রণ করলে গাছে পরিমাণমতো ফল ধরবে ও চাষিরা ভাল লাভ পাবে।

ফলন নিয়ন্ত্রণ :

সাধারণভাবে পেয়ারাগাছে তিনবার ফুল আসে ফাল্গুন-বৈশাখের ফুল, ফল তোলার উপযোগী হয় আষাঢ়-ভাদ্রে, একইভাবে আষাঢ়-শ্রাবণের ফুলে ফল আসে অগ্রহায়ণ-মাঘ মাসে এবং আশ্বিন-কার্তিকের ফুলে ফল ধরে ফাল্গুন-চৈত্র মাসে। বর্ষায় ফল ধরে বেশি, কিন্তু স্বাদ হয় পানসে ও ফলের মান শীত ও বসন্তের ফলের থেকে নিম্ন। শীতে বেশি ফল পাওয়ার জন্য চৈত্র-বৈশাখ থেকে সেচ বন্ধ করে জ্যৈষ্ঠের প্রথমে বাগানের মাটি খুঁড়ে আলগা করে দেওয়া হয়, কিছুদিন পর গাছের ফুল, ফল ও কিছু পাতা ঝরে যায়। জ্যৈষ্ঠের মাঝামাঝি সুপারিশ মাত্রা সার প্রয়োগ করে সেচ দেওয়া হয়। এর ফলে আষাঢ়ে প্রচুর ফুল আসে ও অগ্রহায়ণ-মাঘে ফল তোলার উপযুক্ত হয়। এই পদ্ধতি বারবার অবলম্বন করা উচিত নয়, কারণ এতে গাছের আয়ু কমে যায়।

এছাড়াও কোনো নির্দিষ্ট ডালে বেশি ফুল-ফল পেতে লম্বা ডাল বাঁকিয়ে অন্য ডালের সাথে বা খুঁটির সাথে বেঁধে দেওয়া হয়। ফলে ওই ডালে প্রচুর নতুন শাখা-প্রশাখা আসে ও তাতে ফুল ধরে। এ পদ্ধতিটিও নিয়মিত ব্যবহার করা উচিত নয়, কারণ এতেও গাছ দুর্বল হয় ও রোগপোকায় সহজে আক্রান্ত হয়।

ফল : পেয়ারার ফলন নির্ভর করে জাত, গাছের বয়স, কোন ঋতুর ফল, পরিচর্যা ইত্যাদির উপর। একটি প্রাপ্তবয়স্ক পেয়ারাগাছ গড়ে ৮০-৯০ কেজি ফলন দেয়।

রোগপোকা ও তার প্রতিকার ব্যবস্থা :

১. **ফল ছিদ্রকারী পোকা :** ফল ছিদ্র করে তার মধ্যে ঢুকে যায়, ফল ঝরে পড়ে ও ফলন ক্ষতিগ্রস্ত হয়। কার্বারিল (২.৫ গ্রাম), নিমতেল (২মি.লি.) স্প্রে করলে উপকার পাওয়া যায়।

২. **ডগা ছিদ্রকারী পোকা :** পোকার শুককীটগুলি নরম ডগায় ফুটো করে ঢুকে মজ্জার অংশ খায়। এর ফলে আক্রান্ত ডগা মুকুলসমেত শুকিয়ে যায়। ফলফামিডন (প্রতি লিটার জলে $^{১}/_{২}$ মি.লি.) বা ডাই-ক্লোরভস (প্রতি লিটারে $১^{১}/_{২}$ মি.লি.) অথবা ক্রিটাপ (লিটার ১ গ্রাম) স্প্রে করতে হবে।

৩. **দয়ে পোকা :** এই পোকা দলবদ্ধভাবে রস শুষে খায়। দেখে মনে হয় যেন দইয়ের প্রলেপ দেওয়া হয়েছে। এর ফলে ডালগুলো দুর্বল হয়ে যায় এবং ফলের স্বাভাবিক স্বাদ থাকে না।

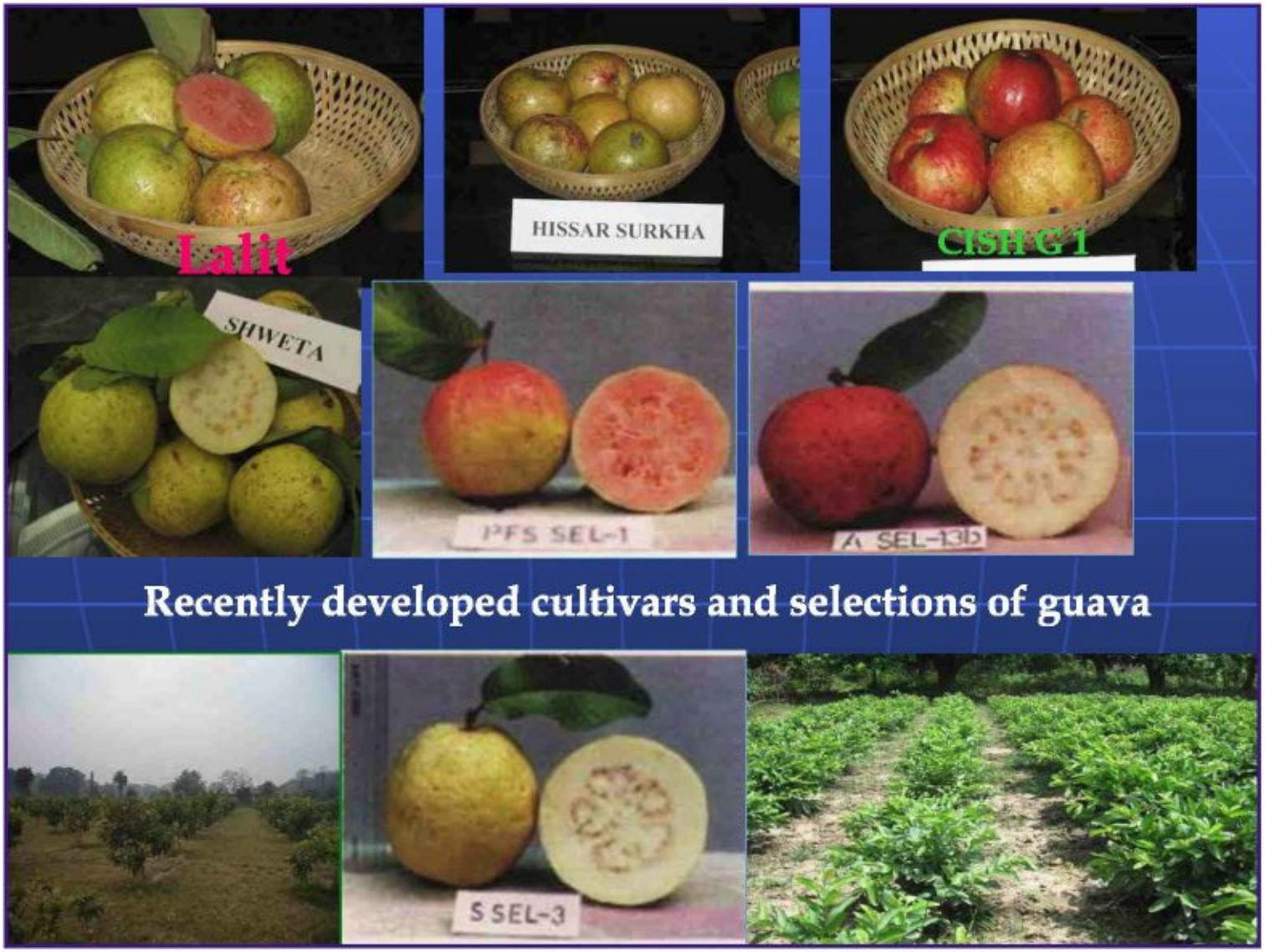

Recently developed cultivars and selections of guava

Sardar
SARDAR
Baruipur
BARUIPUR
Allahabad Safeda
ALLAHABAD SAFEDA
Mohammad Khaja
Mahammed Khaja
Some promising guava cultivars of West Bengal
Dudh Khaja
KAFRI KHAJA
Kazi
Khaja

মনোক্রোটোফস বা ডাইমেথোয়েট প্রতি লিটার জলে দেড় মি. লি. হারে গুলে নিয়ে স্প্রে করতে হবে।

৪. **ফলের মাছি :** এই মাছি ফলের শাঁস খেয়ে নেয়। ম্যালাথিয়ন দেড় এম. এল প্রতি লিটার জলে গুলে ১৫/২০ দিন অন্তর স্প্রে করতে হবে।

৫. **ঢলে পড়া :** ডালের আগার দিক থেকে পাতা হলদে হয়ে ঝরে পড়ে। ডাল ও পুরো গাছ আস্তে আস্তে শুকিয়ে যায়। সুষম সার প্রয়োগ, গাছের গোড়ায় জল জমতে না দেওয়া, আক্রান্ত গাছ ও গাছের গোড়ার মাটিতে কার্বেন্ডাজিম (২ গ্রাম) প্রয়োগ করে সুফল পাওয়া যায়।

লালমাটিতে আঙুর চাষ

পশ্চিমবঙ্গের পশ্চিমাঞ্চলে অবস্থিত জেলাগুলি যেমন বাঁকুড়া, পুরুলিয়া, বীরভূম, পশ্চিম মেদিনীপুর ও বর্ধমানের একাংশে মাটি লাল ও কাঁকুরে এবং জলবায়ু শুষ্ক ও রুক্ষ। এই অঞ্চলের তাড় অর্থাৎ উঁচু জমি ও বাইদ অর্থাৎ মাঝারি উঁচু জমিতে যেখানে আর কোনো কৃষিজ ফসল যথা ধান, গম ইত্যাদি করা যায় না, সেই সব জমি ফলচাষের উপযুক্ত। বাঁকুড়ায় তালডাংরা ব্লকে রাজ্য উদ্যানপালন দপ্তরের যে গবেষণা খামার আছে, সেখানে পরীক্ষামূলকভাবে আঙুর চাষ করে দেখা গেছে এই মাটি ও জলবায়ুতে আঙুর খুব ভালোভাবে চাষ করা যাবে।

জায়গা বাছাই :

জল দাঁড়াতে পারে না এমন জমিতে যেখানে সূর্যের আলো সারাদিন পড়ে, সেটাই আঙুর চাষের উপযুক্ত জায়গা। জায়গা বাছাই করার সময় একটা বিষয় খেয়াল রাখতে হবে জমিতে মাটির গভীরতা যেন অন্তত ২-২$^{১}/_{২}$ ফুট থাকে অর্থাৎ পাথরের স্তর বা শক্ত মোরামের স্তর যা গাছের শিকড় বিস্তারের বিরোধী তা যেন অন্তত ২$^{১}/_{২}$ ফুট তলায় থাকে তবে মাটির গভীরতা কম থাকলেও যদি মোরামের স্তর নরম থাকে তবে আঙুরের জন্য মাটির অম্লত্ব ৬.৫ থেকে ৭.৫-এর মধ্যে হওয়া দরকার, সুতরাং বেশি অম্ল মাটিতে দরকারমতো চুন প্রয়োগ করা উচিত। পরীক্ষায় দেখা গেছে মাটির অম্লত্ব ৬ থাকলে ২০০ গ্রাম ও ৫ থাকলে ৩০০ গ্রাম কলিচুন গাছের গর্ত করার সময় প্রয়োগ করে কিছুদিন ফেলে রাখতে হবে।

জাত নির্বাচন :

লাল ও মোরাম মাটির জন্য উপযুক্ত জাতগুলি নিচে বলা হল।

১। **অর্ক নীলমণি** : কালো রঙের প্রায় বীজহীন আঙুর। ফল হিসাবে খাওয়া ও মদ তৈরি দুভাবে এর ব্যবহার আছে।

২। **পুসা নবরঙ** : কালো রঙের অম্লমধুর জলদি জাতের আঙুর। এই জাতটি বীজযুক্ত এবং রস ও রঙিন মদ তৈরির উপযুক্ত।

৩। **পুসা উর্বশী** : প্রায় বীজহীন সাদাটে সবুজ এই আঙুরগুলো খুবই মিষ্টি। তাই ফল হিসাবে খাওয়া যায়। তবে এই জাতে রোগের প্রকোপ বেশি।

৪। **অর্কাবতী** : প্রায় বীজহীন সাদাটে সবুজ রঙের মিষ্টি আঙুর। ফল হিসাবে খাওয়া, মদ তৈরি উভয়ের জন্যই এই আঙুর চাষ করা যায়।

৫। **অর্ক কাঞ্চন** : হলদে সবুজ রঙের রসালো গোলাকার বীজযুক্ত টকমিষ্টি আঙুর। লাল মাটি অত্যন্ত উপযুক্ত। এই জাত মদ তৈরির কাজে ব্যবহৃত হতে পারে।

জমি তৈরি :

নির্বাচিত জমিকে জঙ্গলমুক্ত করে সমতল করে নিতে হবে। জমিকে একদিকে ঢালযুক্ত করতে হবে, যাতে জল

আঙুর-এর গবেষণা ও চাষের সম্প্রসারণ
F-TANK

গাছের গোড়ায় না জমে। আশ্বিন মাসের প্রথম সপ্তাহে গর্ত খোঁড়ার কাজ করে রাখলে ভালো হয়। গর্তটির পরিমাপ হবে লম্বায় ৩ ফুট, চওড়ায় ৩ ফুট, গভীর (৩ x ৩ x ৩)। আঙুরের জন্য সারি থেকে সারির দূরত্ব ১০ ফুট এবং গাছ থেকে গাছের দূরত্ব ৬" ও ৬"।

গর্ত ভরাট করা :

পৌষ মাসের প্রথমে গর্তে জমির উপরের উর্বর মাটি ১ ফুট দিতে হবে। এর সাতদিন পর ১ ঝুড়ি গোবর বা কমপোস্ট সার এবং উর্বর মাটি ওই গর্তে আরো ১ ফুট দিতে হবে। এরপর ওই গর্তে অন্তত ১৫ লিঃ জল ঢালতে হবে। এর আরো ৭দিন পর গর্তপ্রতি ১ ঝুড়ি অর্থাৎ ১০ কেজি গোবর সার বা কমপোস্ট সার, ১ কেজি নিমখইল, ১ কেজি সিঙ্গল সুপার ফসফেট, সম্ভব হলে ১ কেজি হাড়গুঁড়ো এবং ৫-৭ গ্রাম থাইমেট দিয়ে ভালো করে গর্তে মিশিয়ে আরও ১৫ লিটার জল দিয়ে ৭-১০ দিন ফেলে রাখতে হবে। মাঘ মাসের দ্বিতীয় সপ্তাহে চারা বসানোর ১-২ দিন আগে ভরাট গর্তের মাটি ভালোভাবে কুপিয়ে অল্প জল দিয়ে ভিজিয়ে রাখতে হবে।

চারা সংগ্রহ :

আঙুরের চারা দুটি পদ্ধতিতে প্রস্তুত করা হয়।

১। কাটিং-এর চারা।

২। **জোড় কলমের চারা :** যেখানে রুটস্টক হিসাবে সল্টক্রিক, তেলেকি, ৫-এ, এস.টি. জর্জ ইত্যাদি ব্যবহার করা হয়ে থাকে। চারা সংগ্রহ করা যেতে পারে রাজ্যে উদ্যানপালন দপ্তরের তালডাংরা হর্টিকালচার ফার্ম, বিধানচন্দ্র কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ের আঞ্চলিক গবেষণা কেন্দ্র, ঝাড়গ্রাম ইত্যাদি থেকে।

আঙুরগাছকে আকার দেওয়া :

এই পদ্ধতিটির উপরই আঙুরগাছের ফলন, ফলনক্ষমতা ও আয়ু নির্ভর করে। প্রথমে গাছ বসানোর পর গাছের সঙ্গে ৫ ফুটের একটি ঠেক দেওয়া হয় ও গাছের নীচের দিক থেকে বেরোনো সবচেয়ে স্বাস্থ্যকর ডালটিকে এই ঠেকের উপর বাইতে দিয়ে অপ্রয়োজনীয় ডাল কেটে ফেলা হয়। এই ডালটি যখন ৪ ফুট লম্বা হয়, তখন তার মাথাটি ছেঁটে ফেলা হয়। এরপর "Y" খুঁটির মাচার ওপর দুটি বিপরীতমুখী স্বাস্থ্যকর ডালকে লতিয়ে দেওয়া হবে। ১০' থেকে ১২' লম্বা হওয়ার পর এই ডালগুলির মাথা ছেঁটে দেওয়া হয়। এর থেকে যে শাখাডালগুলি বেরোয় তাদের ২ ফুট পর্যন্ত বাড়তে দেওয়া হয় এবং তারপর তাদের ছেঁটে দেওয়া হয়। প্রতিটি প্রশাখা ডালে ৫ - ৮টি ফল ধরার ডাল বাড়তে দেওয়া হয়।

গাছের ডাল ছাঁটা :

পশ্চিমবঙ্গের লাল মাটি অঞ্চলে জানুয়ারি মাসের ২৫ তারিখ থেকে ফেব্রুয়ারি মাসের ৫ তারিখের মধ্যে ডাল ছাঁটতে হয়। ডাল ছাঁটার কমপক্ষে ৭ থেকে ১০ দিন আগে জলসেচ সম্পূর্ণ বন্ধ করতে হবে।

ফল উৎপাদক ডাল সৃষ্টির জন্য গাছের ঘুম ভাঙানো :

ডাল ছাঁটার পর গাছের ডালের বৃদ্ধি ত্বরান্বিত করতে হাইড্রোজেন সায়নাইড প্রয়োগ করতে হয়, যাতে গাছের ডাল তাড়াতাড়ি বেরোয়। একে গাছের ঘুম ভাঙানো বলে। এক লিটার জলে ৩০ মি.লি. হিসাবে বিকালের দিকে এই হরমোন প্রয়োগ করতে হয়।

সার প্রয়োগ :

আঙুরগাছে সামগ্রিক বৃদ্ধির জন্য নাইট্রোজেন, ফসফেট, পটাশ, ক্যালসিয়াম, ম্যাগনেশিয়াম ও সালফারের পাশাপাশি যেমন জিঙ্ক, বোরন, ম্যাঙ্গানিজ কপার ইত্যাদি প্রয়োগ করতে হয়। গাছের মোট খাদ্যের ৫০-৬০% জৈব সারের মাধ্যমে প্রয়োগ করতে হয়।

বয়স অনুযায়ী গাছপ্রতি খাদ্য প্রয়োগের তালিকা :

গাছের বয়স	গোবর সার (কে.জি)	নাইট্রোজেন (গ্রাম)	ফসফরাস (গ্রাম)	পটাশ (গ্রাম)
প্রথম বছর	১০	১২০	১২০	৮০
দ্বিতীয় বছর	১৫	২৪০	২৪০	১৬০
তৃতীয় বছর	২০	৩৬০	৩৬০	২৪০
চতুর্থ বছর	২৫	৪০০	৪০০	৩২০
পঞ্চম বছর থেকে চলতে থাকবে	৩০	৬০০	৬০০	৪০০

ডাল ছাঁটার ৩-৪ দিন পর সমস্ত গোবর সার ও নাইট্রোজেনের ৩০% জৈব সাররূপে দিতে হবে। এই সময় মাটিতে গাছপিছু ৩০০ - ৫০০ গ্রাম চুন বা ডলোমাইট দিতে হবে, ডাল ছাঁটার ১০ দিন পর মোট সারের ৩০% নাইট্রোজেন, ৬০% ফসফরাস ও ৩০% পটাশ দিতে হবে। ডাল ছাঁটার ৬০ - ৬৫ দিন পর মোট সারের ৩০% নাইট্রোজেন ও ৬০% পটাশ দিতে হবে। ফল পাড়ার পর মোট সারের ১০% নাইট্রোজেন ১০% পটাশ দিতে হবে। রাসায়নিক সার হিসাবে ইউরিয়া ও মিউরেট অফ পটাশ ব্যবহার করা উচিত নয়। পূর্ণবয়স্ক আঙুর গাছ থেকে ১.৫ থেকে ২ ফুট দূরে ২ ফুট চওড়া ও ৪′ - ৬′ রিং করে সার প্রয়োগ করতে হবে। রাসায়নিক সার ড্রিপ পদ্ধতিতে জলসেচের মাধ্যমে দিলে সবচেয়ে ভালো ফল পাওয়া যায়।

আঙুরের পোকা ও তার প্রতিকার :

পশ্চিমবঙ্গের পশ্চিমাঞ্চলে আঙুরে যে পোকা দেখা যায় সেগুলি হল পাতাখেকো পোকা, থ্রিপল, ছারপোকা, শুঁয়োপোকা, কাণ্ডখেকো পোকা, লাল মাকড় ও উইপোকা। পাতাখেকো পোকা ও দয়ে পোকার আক্রমণ ঠেকাতে ডাইক্লোরাভস ২.০ মি.লি. প্রতিলিটার জলে, কাণ্ডপোকা পোকা ও উইয়ের জন্য থাইমেট দানাগাছ প্রতি ৪ গ্রাম হারে, থ্রিপসের জন্য ইমিডাক্লোপ্রিড ৭ মি.লি. প্রতি ১৫ লিটার জলে প্রয়োগ করতে হবে।